টিটেনাস ৪
খোস-পাঁচড়া নিরসনে
নিম সাবান ৫

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ২ সংখ্যা ২ শ্রাবণ ১৪০০

এইডস একটি ভয়াবহ রোগ

ডাঃ রেজিয়া লায়লা আকবর

এইডস কি? এইডস বা একোয়ার্ড ইমমিউনোডেফিসিয়েন্সী সিনড্রোম একটি মারাত্মক রোগ। হিউম্যান ইমমিউনোডেফিসিয়েন্সী ভাইরাস (HIV) দ্বারা আক্রান্ত হলে এ রোগ হয়। এই ভাইরাস দেহে সংক্রমিত হলে ৫–৬ বৎসর পর এমনকি ১০ বৎসর পরেও এইডস রোগ হতে পারে। এইডস রোগের জন্য এখন পর্যন্ত কোন ঔষধ বা টিকা আবিষ্কার হয়নি, ফলে এই রোগ একবার হলে এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু।

হিউম্যান ইমমিউনোডেফিসিয়েন্সী ভাইরাস কি?

এটি এক ধরনের ভাইরাস যা রক্তের শ্বেত কণিকাকে আক্রমণ করে ও ধ্বংস করে (বিশেষ করে লিম্ফোসাইট)। সাধারণতঃ শরীরে যে কোন রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে শরীর সেটা ধ্বংস করার জন্য শরীরে এন্টিবডি তৈরী হয়। কিন্তু এইডস–এর ক্ষেত্রে যে এন্টিবডি তৈরী হয়, কার্যতঃ তারা শ্বেত কণিকাকে রক্ষা না করে বরং ধ্বংস করে, যার ফলে শরীর অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও হারায়।

এইডস কিভাবে ছড়ায়?

১৯৮১ সালের আগে এইডস রোগ অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তারপর থেকে এইডস দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোতে ইতিমধ্যেই এর ফলে বহু লোকের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এইডস ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত নারী বা পুরুষের সাথে যৌন মিলন হলে, আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে সঞ্চালিত হলে বা এইডস ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগীর ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহার করলে এইডস রোগ সংক্রমিত হয়। তাছাড়া এইডস রোগাক্রান্ত মায়ের গর্ভের শিশুরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়।

এইডস–এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কাদের বেশী?

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে সমকামী বা উভকামী নারী ও

(২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

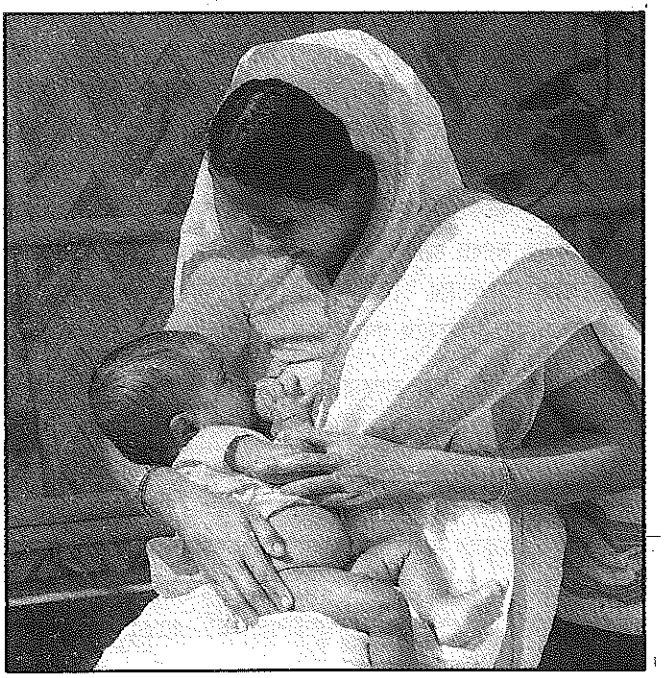

মায়ের দুধই শিশুর জন্য সর্বোত্তম।

মায়ের দুধই শিশুর সেরা খাবার

ডাঃ আসমা ইসলাম ও মাখদুমা খাতুন

আমাদের চারপাশে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে প্রাকৃতিক নিয়মে সকল স্তন্যপায়ী জীব 'শুধু মাত্র' এদের মায়ের দুধ খেয়েই শৈশবে বেড়ে ওঠে। যেমনঃ গরু, ছাগল, বিড়াল ইত্যাদি। মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। এমনকি পবিত্র কোরআনেও সন্তানকে দু'বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে ...." (সুরা বাকারা, ২৩৩ আয়াত)। কিন্তু আধুনিকতার প্রভাবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ইচ্ছা ধীরে ধীরে কমে আসছে। ফলে নানা রকম রোগ-জটিলতা এবং অপুষ্টি দেখা দিচ্ছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে যেসব

(৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

উন্নয়নশীল দেশসমুহের মত বাংলাদেশেও প্রকট জনস্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। আর এই জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেশীর ভাগ মানুষের স্পষ্ট ধারণা নেই। সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য সমস্যা বলতে কেবল রোগ-ব্যাধিকে বোঝেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ব্যবস্থার অভাবে শতকরা ৮০ ভাগ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পানি পান করলে এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী পায়খানার ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে ডায়রিয়াজনিত রোগ যেমনঃ কলেরা, আমাশয় এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানি বাহিত পেটের পীড়া সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ডায়রিয়াজনিত রোগের একমাত্র কারণ হিসেবে অস্বাস্থ্যকর পয়ঃ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৫ সাল হতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৪ লক্ষ স্যানিটারী পায়খানা (স্লাব ল্যাট্রিন) উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ১০ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। সাধারণতঃ একটি স্লাব ল্যাট্রিনের স্বাভাবিক ব্যবহারকাল ৫/৬ বছর। কিন্তু কিছু পায়খানা এর আগেও অকেজো হয়ে পড়ে। প্রকৃত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা আরও কম। তবে ইউনিসেফ স্থানীয় উপকরণ দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী পরিবারের নিজস্ব পায়খানাকেও স্যানিটারী পায়খানা হিসেবে গণ্য করছে।

ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায় যে বাড়ীতে তৈরী পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে দেশের শতকরা ২৬ ভাগ লোক স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বিশেষ সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের তিনটি থানায় প্রায় ৮০ ভাগ লোককে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের ৯০ ভাগ লোকের জন্য কোন স্বাস্থ্যসম্মত পয় ব্যবস্থা নেই। কাজেই সংগত কারণেই প্রশ্ন আসে এই বিপুল জনগোষ্ঠী কোথায় মলত্যাগ করেন। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিদিন উন্মুক্ত স্থানে বিপুল পরিমাণে (২৮ হাজার মেট্রিক টন) মল ত্যাগ করা হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে ঝুলন্ত পায়খানার ব্যবহার (Hanging latrine)। নদী, নালা, খাল, বিল, লঞ্চ, ষ্টীমার, ট্রেন ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ এ পর্যন্ত সোয়া ৮ লক্ষ নলকূপ স্থাপন করেছে। তন্মধ্যে প্রায় এক লক্ষ নলকূপ স্থায়ী ও সাময়িকভাবে বিকল রয়েছে। হিসাব অনুযায়ী দেশের ১২৫ জন লোকের জন্য একটি নলকূপ থাকার কথা এবং শতকরা ৮১ ভাগ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানির সুবিধা রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে যে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ লোক থালাবাটি ধোয়া, গোসল ইত্যাদি সহ সকল কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করে।

উপরোক্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। দূষিত পানির ব্যবহারের ফলে ডায়রিয়ার মত মারাত্মক রোগ এবং অন্যান্য রোগ যেমনঃ হেপাটাইটিস, জন্ডিস, টাইফয়েড জ্বরসহ নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। রোগ প্রতিরোধ করতে হলে অবশ্যই জরুরী ভিত্তিতে জনস্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। কেননা আমাদের মত গরীব দেশে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় মানব বা অর্থ সম্পদ উভয়েরই তীব্র সংকট রয়েছে। আশার কথা, সরকারের কর্মসূচীর পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসমুহ বাংলাদেশের পয়ঃ ব্যবস্থা এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব পূরণে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের প্রধান মহামারী বলে বিবেচিত ডায়রিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধে সাফল্য অর্জন করতে হলে জনস্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে অনতিবিলম্বে দীর্ঘ-মেয়াদী সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এইডস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরুষের এ রোগ বেশী হয়। এইডস-এ আক্রান্ত রোগীর সাথে যৌন মিলন ঘটলে এইডস রোগ হবেই। তাছাড়া বারবণিতা বা পতিতাদের মধ্যেও এ রোগের প্রকোপ বেশী।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ করে যারা ইনজেকশন দ্বারা মাদকদ্রব্য নেন বা একই সিরিঞ্জ ও সূঁচ ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে এইডস-এ আক্রান্তের সংখ্যা বেশী। তাছাড়া এইডস রোগাক্রান্ত মহিলার দ্বারা তার গর্ভের শিশুও এইডস-এ আক্রান্ত হতে পারে।

এইডস প্রতিরোধ

এইডস রোগের কোন চিকিৎসা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে পারেননি। এইডস প্রতিরোধ করতে পারে এমন টিকা বা ইনজেকশনও আবিষ্কৃত হয়নি।

এইডস একটি মারাত্মক ব্যাধি। একবার এইচ.আই.ভি. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে এইডস রোগ হবেই এবং এইডস হলে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এইডস তেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। তবে ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে ৯ জন এইডস রোগীকে সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭ জন বিদেশে কর্মরত অবস্থায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১ জন এইডস রোগীর স্ত্রী ও অপর জন বিদেশী। ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে এইডস রোগের প্রকোপ বেশ বড় আকারে হচ্ছে। ফলে এ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের এখন থেকে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন। তাছাড়া যৌন রোগ হলে তা গোপন রাখার প্রবণতা বেশি। এ সমস্ত কারণে কোনক্রমে একবার এইডস রোগ শুরু হলে তা মহামারীর আকার ধারণ করবে। এ ধরনের মহামারীর মোকাবেলা বা এইডস রোগীর চিকিৎসা করার জন্য যে দক্ষ কর্মী ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন তা আমাদের আর্থিক সংগতির বাইরে। কাজেই সময় থাকতে এইডস রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা

গ্রহণ করা উচিত। এইডস দোরগোড়ায় এসে গিয়েছে, এখনই ব্যবস্থা গৃহীত না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

প্রতিরোধ পদ্ধতিসমূহ

যেহেতু এইডস কিভাবে ছড়ায় তা আমরা জানি, কাজেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ।

* জরীপকরণ ঃ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি বা যাদের মধ্যে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা বেশী অর্থাৎ পতিতা, মাদকগ্রস্ত ব্যক্তি, জাহাজে কর্মরত শ্রমিক, দূরপাল্লার ট্রাক চালকদের কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা তা জরীপ করা দরকার। আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাতে এ রোগ ছড়াতে না পারে সে ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পতিতাদের মধ্যে কনডম ব্যবহারের উপর এবং মাদকগ্রস্তদের সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহারের উপর বিশেষ শিক্ষামূলক কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। বহিরাগত বিশেষ করে উপদ্রুত দেশসমূহ থেকে আগতদের রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
* ধর্মীয় শিক্ষা ঃ ব্যভিচার করা থেকে বা প্রাক বিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার কথা ধর্মীয় বিধান আছে, তার উপর গুরুত্ব দিয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিতে হবে। জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
* যৌন শিক্ষা ঃ প্রাক বিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন অপকর্মের কুফলের উপর জোর দিতে হবে। সমকামীতা ও পতিতালয়ে গমনের ফলে কি কি রোগ হতে পারে সে ব্যাপারে ভালভাবে বোঝাতে হবে। কনডম ব্যবহার করলে নিজের ও অন্যের রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে তা বোঝাতে হবে।

এ রোগ যাদের বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

- পতিতাদের মধ্যে রোগাক্রান্ত কেউ থাকলে তাকে চিহ্নিত করা ও তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। পতিতারা যাতে তাদের খদ্দেররা কনডম না নিলে তার সাথে যৌন মিলন হতে বিরত থাকে ও অন্যান্য স্বাস্থ্য শিক্ষা।
- মাদকগ্রস্ত ব্যক্তিরা যাতে তাদের মাদকাসক্তির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় সে ব্যাপারে বোঝাতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। একই সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহার করলে দেহে কিভাবে এইচ.আই.ভি. ভাইরাস প্রবেশ করে ও এইডস হলে যে মৃত্যু ছাড়া নিস্তার নেই তা বলতে হবে।
- এইডস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি ভালভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- এইডস রোগীর চিকিৎসা যাঁরা করবেন তাঁদের গায়ে যেন কোন

ক্ষত, কাটা, ছেঁড়া না থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। তা না হলে এসব ক্ষতের মাধ্যমে তাঁরা এইডস রোগাক্রান্ত হতে পারেন।

- পেশাদার রক্তদাতাদের নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সে যাতে কোনক্রমেই রক্ত বিক্রি না করতে পারে সে ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে গেলে রোগ হবেই।
- মনে রাখবেন, এইচ.আই.ভি. কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ৫–৬ বছর বা আরও বেশী দিন এমনকি ১০ বছর পর্যন্ত কোন উপসর্গ দেখা না যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা রোগ সংক্রমণ করতে পারেন। অর্থাৎ রোগ জীবাণু শরীরে আছে এমন ব্যক্তির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলেই বা তার রক্ত শরীরে গেলে এইডস সংক্রমণ হবে।

এইডস–এর উপসর্গ

প্রাথমিক পর্যায় ঃ ৫–৬ বছর বা তারও বেশী সময় পর্যন্ত এইডস রোগীর কোন উপসর্গ দেখা যায় না। তবে এই পর্যায়েও তার শরীর থেকে অন্য রোগীর শরীরে রোগ সংক্রমণ হতে পারে।

পরবর্তী পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে দেখা যাবে যে রোগী আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে, তার ওজন কমে যাচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, ডায়রিয়া হচ্ছে, সর্দি জ্বর, কাশি ও রাত্রে শরীর ঘামাচ্ছে, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, ক্ষুধা মন্দা, জ্বর ও গ্রন্থি ফুলে যাচ্ছে।

শেষ পর্যায় ঃ রোগীর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাবে, যে কোন রোগই সহজেই আক্রমণ করতে পারবে। নিউমোনিয়া, মস্তিষ্কের বিকার ও ক্যানসার ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং রোগী ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর যক্ষা হলে তার মারাত্মক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। এই পর্যায়ে রোগী দেড় থেকে দু'বছরের মধ্যে মারা যাবে। এইডস–এর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

এইডস রোগীর জন্য করণীয়

এইডস একটি মারাত্মক ব্যাধি। তবে এইডস রোগীর সাথে সাধারণভাবে চলাফেরা বা মেলামেশা করলে এইডস হয় না।

এইডস রোগীরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তাঁরা যাতে তাঁদের শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক বিপর্যয়ের জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও সাহায্য পান তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এইডস রোগ হলে তার জন্য স্নেহ, ভালবাসা ও শান্তনা অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিবারের সকলকে এ ব্যাপারে সহৃদয় এবং সহানুভূতিশীল হতে হবে। ডাক্তারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইডস রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা তাঁর বাড়ীতেই হওয়া উচিত। অবশ্য সাথে অন্যান্য কঠিন রোগ যেমন নিউমোনিয়া ইত্যাদি হলে হাসপাতালে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

এইডস রোগীর যত্নকারীগণকে নিজেদের স্বার্থে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনবোধে গ্লাভস পরতে হবে। সেবা দেয়ার পর হাত জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

মনে রাখবেন, এইডস একটি মারাত্মক ব্যাধি হলেও সাধারণ কথা বার্তায়, মেলা মেশায় এ রোগ সংক্রমিত হয় না এবং এইডস রোগীকে মানসিকভাবে শান্তনা দেয়া, সংবেদনশীল হওয়া শুধু পারিবারিক নয়, সামাজিক কর্তব্যও।

*১২ই জুলাই ১৯৯৩ তারিখে ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় বাংলাদেশে আরো ৩ জন এইডস রোগীর সন্ধান লাভের খবর প্রকাশিত হয়েছে।

টিটেনাস

ডাঃ এ.এস.এম. মিজানুর রহমান

বাংলাদেশে শিশু–মৃত্যুর কারণ অনেক। তবে এর মধ্যে জন্মের প্রথম দু'সপ্তাহের মধ্যেই শিশুর মৃত্যু ঘটাতে পারে যে কয়টি রোগ তার মধ্যে টিটেনাস প্রধান।

টিটেনাস একটি মারাত্মক রোগ। কারণ এই রোগে আক্রান্ত শিশুর প্রায় শতকরা ৯৩ জনই মারা যায় (Bangladesh Health Profile, 1977)। কেবলমাত্র রোগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে যদি রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করানো যায় তবেই রোগীর বাঁচার আশা থাকে। রোগের চিকিৎসা যত দেরীতে শুরু হবে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা তত বেশী।

কাজেই এ রোগের চিকিৎসায় দু'টি পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

* শুরুতেই রোগের লক্ষণ বুঝতে পারা এবং
* রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া।

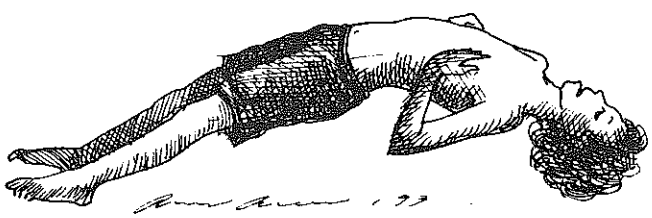

টিটেনাস রোগের জীবাণু কোন ক্ষতের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে এ রোগের শুরু হয়। টিটেনাসের জীবাণু ধূলা–বালি, ময়লা ইত্যাদিতে থাকে। মরিচা ধরা পুরান লোহা, টিন ইত্যাদি দ্বারা কেটে গেলে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। নবজাত শিশুর বেলায় নাড়ী কাটার ক্ষতের মধ্যে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। নাড়ী কাটার জন্য ব্যবহৃত কাচি, ব্লেড বা বাঁশের চটা অপরিষ্কার থাকলে এ রোগ হতে পারে। পরবর্তীতে নাড়ীর ঘা কাঁচা থাকা অবস্থায় তাতে ধূলা–ময়লা লেগে গেলেও টিটেনাস হতে পারে।

নাড়ী কাটার অস্ত্র স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জীবাণুমুক্ত করা থাকলে এবং পরবর্তীতে নাড়ীর ঘা–এর উপযুক্ত পরিচর্যা করলে টিটেনাসের জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই দিয়ে প্রসব

ও প্রসব পরবর্তীতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা করলে এ রোগ হবার আশংকা অনেক কমে যায়।

যদি শিশুর নাড়ীর ক্ষতে টিটেনাসের জীবাণু প্রবেশ করে, তবে পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়। এ লক্ষণ হলো শিশুর হঠাৎ হঠাৎ কেঁদে ওঠা। এই কেঁদে ওঠার কারণ হলো শিশুর চোয়াল-পেটে-পিঠের মাংসপেশীতে ব্যথা এবং এ সময় শিশু বুকের দুধ টেনে খেতে পারে না। কিন্তু শিশুর এই কান্নার কারণ যে তার মাংসপেশীর ব্যথা সেটা বোঝা কঠিন। কারণ শিশু তো তার ব্যথার কথা বলতে পারে না। কাজেই এই কান্নার প্রকৃত কারণ মায়েরা অনেক সময় বুঝতে পারেন না।

পরবর্তীতে এই ব্যথা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং খিচুনীতে রূপ নেয়। এ অবস্থায় রোগ নির্ণয় যদিও সহজ কিন্তু চিকিৎসা সহজ নয়। যাহোক খিচুনীর জন্য মুখের মাংসপেশীতে টান পড়ে এবং মুখের চেহারায় একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। এই সঙ্গে পিঠের মাংসপেশীতে খিচুনীর জন্য শরীর ধনুকের মত বেঁকে যায়। যার জন্য টিটেনাসকে বাংলায় ধনুষ্টংকার বলা হয়।

এ সময় সামান্য আওয়াজ, আলো ইত্যাদির কারণে রোগীর খিচুনী শুরু হয়ে যায় ও ক্রমাগত এটা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে বুকের পেশীর খিচুনীর জন্য রোগীর শ্বাস কষ্ট শুরু হয় এবং প্রতি খিচুনীর সাথে মুখ নীল হতে থাকে। ক্রমাগত এ অবস্থা চলার ফলে রোগীর শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়।

রোগের উপরোক্ত বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নবজাত শিশুর জন্য টিটেনাস একটি মারাত্মক যন্ত্রনাদায়ক রোগ যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিশুর মৃত্যু ঘটায়। এ কারণে শিশুর যাতে এ রোগ না হয় সে দিকেই সচেষ্ট হওয়া সবচেয়ে ভাল। সুখের বিষয় এই যে বর্তমানে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে এই ভয়াবহ রোগের প্রকোপ অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য এই রোগের টিকা নেয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যেকের বিশেষ করে মা'দের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা দরকার।

টিটেনাসের জন্য টিকা দেয়ার পদ্ধতি ঃ

গর্ভবতী মা'দের জন্য : গর্ভবতী মা'দের অবশ্যই গর্ভধারণ করার ৪-৭ মাসের মধ্যে ১ মাস অন্তর ২টি টিটেনাস টক্সয়েড (টি.টি.) ইনজেকশন নেয়া উচিত। এর ফলে এক দিকে যেমন মা প্রসবকালীন এবং পরবর্তী সময়ে এ রোগের হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন — অন্য দিকে তাঁর নবজাত শিশুও টিটেনাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

শিশুর জন্য : শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ হলে প্রতি ১ মাস অন্তর অন্তর ৩টি ডি.পি.টি. ইনজেকশন নিতে হবে।

শিশুর বয়স ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর : ১ বার টি.টি. বাড়তি টিকা দিলে ভাল হয়।

টিটেনাস প্রতিরোধক টিকা নিলে টিটেনাসের মত মারাত্মক রোগের হাত থেকে সবাই মুক্ত থাকতে পারে। কাজেই যারা এখনও এই টিকা নেননি তাঁরা নিকটবর্তী কোন টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে টিকা নেয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করা যায়।

খোস-পাঁচড়া নিরসনে নিম সাবান

মাহমুদা খাতুন

খোস-পাঁচড়া এক ধরনের অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই এর প্রকোপ দেখা যায়। এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর মাধ্যমে এর সংক্রমণ ও বিস্তার ঘটে। স্বল্প পরিসরে অধিক লোকের বসবাস, আলো বাতাসহীন স্যাঁতস্যাতে পরিবেশ, অপ্রতুল পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনের অব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব খোস-পাঁচড়া হওয়ার প্রধান কারণ। পরিবারের যে কেউ এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর পরই অন্যান্যদের মধ্যেও এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমে আংগুলের ফাঁকে ও শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। রোগ সংক্রমণ ঘটার পর শরীরে সারাক্ষণ বিরক্তিকর চুলকানি অনুভূত হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করে থাকে। তার সাথে আবার রয়েছে সামাজিক বিড়ম্বনা। রোগের শুরুতেই সচেতন না হলে কিছুদিনের মধ্যেই খোস-পাঁচড়া সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং যতই দিন যায় ততই জটিল হতে থাকে। নখ দিয়ে চুলকানোর সময় চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে তাতে পুঁজ হয়। শরীরে অল্প অল্প জ্বর ও ব্যাথা অনুভূত হয়। এ চুলকানি রাতে বেড়ে যায়, ফলে ঘুমের খুবই ব্যাঘাত হয়। তার সাথে আবার অনেকের অরুচিও দেখা দেয়। এসব কারণে ক্রমেই শরীর খারাপ হতে থাকে।

জটিলতা

এ রোগের দু'টি প্রধান জটিলতা হল বাতজ্বর ও কিডনীর প্রদাহ (নেফ্রাইটিস)। এসব জটিলতা অনেকক্ষেত্রে শিশু-মৃত্যুর কারণও হতে পারে। সাধারণতঃ আমরা এর প্রতি কোন গুরুত্বই দেই না। অনেকে আবার সামাজিক বিড়ম্বনার ভয়ে অনেকদিন ধরে এই সংক্রমণকে লুকিয়ে রেখে জটিল করে তোলেন। আবার অনেকেই অজ্ঞতার কারণে দায়িত্বহীনভাবে খাবার প্রস্তুত, পরিবেশন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থেকে অগণিত লোকের মধ্যেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটান। সামান্য ব্যক্তিগত সচেতনতা এ রোগের সংক্রমণ ও বিস্তারকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে পারে। খোস-পাঁচড়া প্রতিহত করার বিষয়টিকে আমরা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। যেমনঃ

* প্রতিকার ও
* প্রতিরোধ

প্রতিকার

নিম সাবান ব্যবহার করে এ রোগ হতে সহজেই প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। কারণ নিম সাবান নিম পাতার প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরী যা প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে খোস-পাঁচড়া, চুলকানির চিকিৎসায় প্রচলিত। নিম সাবানের দাম সবারই ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

এর ব্যবহার সাধারণ সাবানের মতই এবং নিরাপদ। প্রতিদিন গোসল করার সময় নিম সাবান ব্যবহার করে শরীরের ধুলাবালি ও ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে গরম পানিও ব্যবহার করা যেতে পারে। অথবা বড় এক বালতি পানিতে কিছুটা লবণ মিশিয়ে সেই পানি দিয়ে গোসল করলেও উপকার পাওয়া যায়। গোসলের সময় শরীর ভাল করে রগড়িয়ে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। আর কেহ যদি নিম সাবান যোগাড় করতে না পারেন তবে নিমপাতা বেটে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে। প্রতিদিনের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর, বালিশের কভার ইত্যাদি ধুয়ে ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। মোটকথা ধুয়ে রোদে শুকিয়ে জীবাণুকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। সবশেষে যদি এতেও উপশম না হয় তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

প্রতিরোধ

প্রতিরোধের প্রথম ও প্রধান উপায় হল শারিরীক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। আর এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অবশ্য করণীয় হচ্ছেঃ

* প্রতিদিন পরিষ্কার পানিতে গোসল করে শরীরকে ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণুমুক্ত রাখা।
* পরিষ্কার কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্র ব্যবহার করা।
* হাতের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখা।
* বাড়ীর আঙ্গিনা ও চারপাশ পরিষ্কার রাখা।

এছাড়াও শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে হবে। তাদেরকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে এবং গোসল করানোর সময় শরীরের ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা ময়লা ঠিকমত পরিষ্কার করতে হবে। হাতের নখ নিয়মিত কেটে ছোট রাখতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটু সচেতন হলেই সুন্দর স্বাস্থ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে পারি ও খোস-পাঁচড়ার মত ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি।

স্বাস্থ্য কুইজ-৫

১. কমপক্ষে কয়টি রক্ত আমাশয়ের জীবাণু দ্বারা রক্ত আমাশয় হয়?

২. হামের সাধারণ তিনটি জটিলতা (যা দ্বারা শিশু হামের পর বেশী আক্রান্ত হয়) কি কি?

৩. আই.ইউ.ডি. কখন পরা সবচেয়ে নিরাপদ?

৪. শিশুরা তেল কি হজম করতে পারে? শিশুর খাবারের পুষ্টিমান কি দিয়ে সহজে বাড়ানো যায়?

৫. কোথায় এবং কত সালে বিশ্বে সর্বপ্রথম কলেরার মহামারী শুরু হয়?

(উত্তর আমাদের কাছে ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ তারিখের আগেই পৌঁছাতে হবে।)

স্বাস্থ্য কুইজ-৪-এর উত্তর

১। শুধুমাত্র বুকের দুধ দিলে পানি পান করানোর প্রয়োজন নেই। কারণ একটি শিশুর যে পরিমাণ পানি প্রয়োজন তা বুকের দুধ থেকেই সে অনায়াসে পেয়ে থাকে।

২। ক. অতি সত্বর আপনার এলাকার স্যানিটারী ইনস্পেক্টর, হেলথ ইনস্পেক্টর অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে খবর দিন।

খ. আপনার এলাকার ঘরে ঘরে লবণ গুড় অথবা চালের গুড়ার স্যালাইন ব্যবহারের নিয়ম শিখিয়ে দিন। মনে রাখবেন মহামারীর সময় ডায়রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে খাবার স্যালাইন অথবা লবণ গুড় স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে এবং যতক্ষণ ডায়রিয়া থাকবে ততক্ষণ তা প্রচুর পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

গ. গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন সদস্য, ভিডিপি কর্মী, ইমাম, স্কুল শিক্ষক অথবা চেয়ারম্যানের সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলুন। ডায়রিয়া প্রতিরোধের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে এবং আপনি নিজে প্রতিদিন আক্রান্ত হবার ও মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ করে ঐ দিনই স্যানিটারী ইনস্পেক্টর অথবা হেলথ ইনস্পেক্টরের কাছে পাঠাবেন। তথ্যের মধ্যে নাম, ঠিকানা, আক্রান্ত হবার এবং মৃত্যুর সময় ও তারিখ অবশ্যই থাকতে হবে।

ঙ. বিশেষ কোন জায়গায়, যেমন স্কুল ঘরে, ইউনিয়ন পরিষদের অফিস অথবা এমন একটা ঘর যেখানে বেশ কিছু সংখ্যক রোগীকে শোয়ানো যায় সেখানে অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রের বন্দোবস্ত করুণ। স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চ. মারাত্মক রকম পানি শূন্যতায় ভুগছে এমন রোগীকে আন্তঃ শিরা কলেরা স্যালাইন (IV স্যালাইন) দিয়ে চিকিৎসা করবেন।

৩। দুই মাসের চেয়ে কম বয়সের শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ৬০-এর বেশী হলে শিশুটিকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কিন্তু দুই মাস থেকে এক বৎসর বয়সের শিশুদের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ৫০-এর বেশী হলে এবং এক বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুদের শ্বাসের গতি ৪০-এর বেশী হলে এবং নিশ্বাস নেবার সময় শিশুর গায়ের রং নীলাভ (Central cynosis) হয়ে গেলে অথবা পাঁজরের হাড় ভিতরের দিকে ঢুকে গেলে (chest indrwaing) তবেই হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

৪। জন্ম ওজন ঃ ছেলে-৩-৩.৩ কেজি, মেয়ে -৩-৩.২ কেজি

স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন ঃ ২·৫ কেজি

৫। ৯৬টি

স্বাস্থ্য কুইজ-৪-এর সঠিক উত্তরদাত্রীর নাম

জুলেখা হাবিব
প্রযত্নে ঃ আকবর হোসেন
ন্যাশনাল ক্রেডিট এ্যাণ্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ
মিরপুর ১০, ঢাকা।

মায়ের দুধই শিশুর সেরা খাবার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিশুরা মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের মধ্যে তিন থেকে চার মাস বয়সের শিশুদের মৃত্যু-হার মায়ের দুধ খাওয়া শিশুদের তুলনায় শতকরা ১০-১৫ ভাগ বেশী। ১৯৮৬ সালের এক জরীপে দেখা গিয়েছে যে ঢাকা শহরে ৩-৪ মাস বয়সের শতকরা ৪৯ ভাগ শিশুরা 'শুধু মাত্র' মায়ের দুধ খেয়ে থাকে। যদিও গ্রামের মায়েরা শতকরা ৯৭ ভাগ শিশুকে এক বৎসর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ায়, কিন্তু সেই সাথে এক মাস বয়সেই তোলা দুধ খাওয়ানো আরম্ভ করে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ইচ্ছা ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার পেছনে নানাবিধ কারণ কাজ করে থাকে। যেমনঃ

* আধুনিক জীবনধারা প্রচলিত হওয়ায় ঐতিহ্যগত/সনাতন ধারা থেকে দূরে সরে যাওয়া, কর্মজীবী মায়েদের বহির্মুখী ব্যস্ততা;
* গুড়া দুধের বহুল প্রচার এবং সরবরাহ;
* গুড়া দুধ কোম্পানী কর্তৃক আকর্ষণীয় দুধের বোতলের প্রচার;
* মা'কে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রতি উৎসাহিত করার অভাব এবং বুকের দুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা।
* গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকালীন সময় মানসিক এবং পুষ্টি বিষয়ক যে সমস্ত জ্ঞান থাকা উচিত সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

এই সকল সমস্যা সমাধান এবং শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ইচ্ছাকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ গর্ভবতী মায়েরা সর্ব প্রথম মাঠকর্মী অথবা দাই-এর নিকট হতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ৪৫,০০০ মাঠকর্মী কর্মরত আছেন। অতএব, আমরা যদি মাঠকর্মীদের মাধ্যমে মায়ের দুধের উপকারিতা, মা'দের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে সঠিকভাবে সচেতন করে তুলতে পারি তবেই শিশুদের 'শুধু মাত্র' বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি পাবে।

মায়ের দুধের উপকারিতা

* মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই এবং মায়ের দুধই শিশুর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, উত্তম এবং সুরক্ষিত ব্যবস্থা;
* মায়ের দুধ শিশুকে নানারকম রোগ যেমন ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হাঁপানী এবং চর্মরোগ ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা করে;
* শিশুর শারিরীক বৃদ্ধি ও সর্বাংগীন বিকাশের সকল গুণাগুণ মায়ের দুধে পাওয়া যায়;
* মায়ের দুধ সহজেই হজম হয় এবং এর পুষ্টিগুণ ক্ষমতা অন্যান্য দুধের তুলনায় সর্বাধিক;
* সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের জরায়ু দ্রুত সংকুচিত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ফলে তাড়াতাড়ি গর্ভফুল বাইরে বের হয়ে আসে এবং রক্তপাত কম হয়;
* মায়ের দুধ খেলে শিশু এবং মায়ের মধ্যে মাতৃত্বের বন্ধন গভীর হয় ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে;
* যে সমস্ত মায়েরা দীর্ঘ দিন ধরে শিশুকে শুধু মাত্র বুকের দুধ খাওয়ান তাঁদের পুনরায় গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে (বিশেষ করে প্রথম ৬ মাস);
* বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে;
* মায়ের বুকের দুধের জন্য কোন খরচ লাগে না। তাছাড়া কোন বাসনপত্র, বোতল, নিপল, গুড়া দুধ কিংবা জ্বালানীরও দরকার হয় না। ফলে মায়ের দুধ দূষিতও হয় না এবং কোন বাড়তি সময়েরও প্রয়োজন হয় না। যে কোন সময়ই এ দুধ পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও আই.সি.ডি.ডি.আর,বি. পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যে সমস্ত মায়েরা তাঁদের সন্তানদের শুধু মাত্র কিংবা দীর্ঘদিন ধরে বুকের দুধ খাওয়ান সেই সমস্ত শিশুদের কলেরা, আমাশয় এবং দীর্ঘমেয়াদী পাতলা পায়খানা হবার সম্ভাবনা বোতলের দুধ খাওয়া শিশুদের তুলনায় অনেক কম। এ সমস্ত রোগে আক্রান্ত হলেও তারা দ্রুত সেরে ওঠে। আরও দেখা গিয়েছে যে প্রথম ৬ মাস "কেবল মাত্র বুকের দুধ" এবং পরবর্তীতে বাড়তি খাবারের পাশাপাশি তিন বৎসর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুদের ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রাতকানা রোগও কম হয়ে থাকে।

গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মা'দের প্রতি মাঠকর্মীর দ্বারা প্রচারিত এবং ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগকৃত ৫টি তথ্য — যা বুকের দুধ খাওয়ানোর স্পৃহা জাগাতে সহায়তা করবেঃ

(আই.পি.এইচ.এন., ইউনিসেফ এবং আই.সি.ডি.ডি.আর,বি. কর্তৃক প্রকাশিত "বুকের দুধ শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা" থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে)।

১. জন্মের পরপরই শিশুকে বুকের প্রথম শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
২. গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে পুষ্টি এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য বেশী করে খাবার খেতে হবে।
৩. পাঁচ মাস পর্যন্ত শুধু মাত্র বুকের দুধই যথেষ্ট।
৪. পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশপাশি পরিবারের অন্যান্য খাবার খাওয়াতে হবে।
৫. যে কোন অসুখে শিশুকে বুকের দুধ ও অন্যান্য খাবার বার বার খেতে দিতে হবে।

এছাড়াও মায়েদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগতে পারে সেগুলোর উত্তরও মাঠকর্মীরা নিম্নলিখিতভাবে দিতে পারেন ঃ

প্রশ্ন	উত্তর
সব মা কি বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন?	হ্যাঁ, প্রত্যেক মা-ই বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন।
সব মায়ের কি পর্যাপ্ত বুকের দুধ হয়?	হ্যাঁ, মায়েরা শিশুর চাহিদানুযায়ী বুকের দুধ দিলে পর্যাপ্ত দুধ তৈরী হবে। মা যদি মনে করেন যে তাঁর বুকে যথেষ্ট দুধ নেই, সেই মাকে ভরসা ও উৎসাহ দিন। সফলভাবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হলে মায়ের নিজের ওপর আস্থা থাকতে হবে।
বুকের দুধ কি নষ্ট হয়?	না, বুকের দুধ নষ্ট হয় না। বুকের দুধ সর্বদাই বিশুদ্ধ, শিশুর জন্য উপযোগী ও নিরাপদ।
মায়ের স্তনে প্রদাহ বা স্তনে বোঁটায় ক্ষত দেখা দিলে কি করতে হবে?	এটি সাধারণ সমস্যা। বুকের দুধ নিংড়ে বোঁটার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে বাতাসে শুকাবেন। শুকনা গরম সেঁক দেবেন। শিশুকে বুকের দুধ দেয়ার অবস্থান ভুল থাকলে ঠিক করে নেবেন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে।
শিশুকে বোতলে দুধ খাওয়ানো কি বিপজ্জনক?	হ্যাঁ, বোতলে দুধ খাওয়ানো খুবই বিপজ্জনক। দুধ এবং পানির পরিমাণ ঠিক না হলে অর্থাৎ খুব বেশী পানি এবং অল্প গুড়া দুধ মিশালে অপুষ্টি দেখা দিতে পারে। তাছাড়া বোতল/নিপল বা উভয়ই অপরিষ্কার থাকতে পারে। তৈরী করার সময় বা পরে এই দুধ সহজেই বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা দুষিত হতে পারে। ফলে অপুষ্টি ও ডায়রিয়া উভয়ই দেখা দেয়।

সার কথা হচ্ছে যে পৃথিবীতে যে নতুন শিশুর জন্ম হচ্ছে তার জন্য মায়ের বুকের দুধই একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

জেনে রাখা ভাল

ফোস্কা পড়লে ঃ

সাধারণতঃ পুড়ে গেলে অথবা প্রচণ্ড তাপ লাগলে ফোস্কা পড়ে আবার কোন কোন অসুখ যেমনঃ জল বসন্ত, হারপিস জষ্টার (এক ধরনের ভাইরাস) ইত্যাদিতে ত্বকে ফোস্কা পড়ে। পুড়ে যাওয়ার ফলে ছোট ফোস্কা পড়লে এক সপ্তাহেই মোটামুটি ভাল হয়ে যায়।

ফোস্কা না গালানোই ভাল। কিন্তু ফোস্কার ফলে যদি তীব্র কষ্ট হয় এবং আপনি যদি একান্তই গলিয়ে ফেলতে চান, তবে ঃ

১. আপনার হাত ও ফোস্কার জায়গা পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।
২. পরিস্কার, চিকন, সুঁচ আগুনে পুড়িয়ে নিন এবং তা ঠাণ্ডা হতে দিন। সুঁচের পোড়ানো অংশে হাত লাগাবেন না।
৩. এবার সুঁচটি চামড়ার উপর রেখে শান্তভাবে ফোস্কার গায়ে লাগান। যতটুকু লাগালে ফোস্কাটি ফেটে যায়, ঠিক ততটুকু লাগাতে হবে।
৪. এবার সুঁচটা সরিয়ে নিয়ে প্রথম ছিদ্রের উল্টো দিকে আর একটি ছিদ্র করুন।
৫. এবার পরিস্কার তুলার ছোট একটি টুকরা দিয়ে ফোস্কার উপর চাপ দিন। জায়গাটি ভাল করে মুছে নিন।
৬. বাজারে যে 'এডহেসিভ ড্রেসিং' কিনতে পাওয়া যায়, তা ফোস্কার জায়গায় লাগিয়ে দিন। ফোস্কা যদি আপনা-আপনি গলে যায়, তবে তা বাতাসে উন্মুক্ত রাখা উচিত। তবে ফোস্কার জায়গাটি অবশ্যই পরিস্কার রাখতে হবে। ধুলা-বালি পড়ার সম্ভাবনা থাকলে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে রাখাই ভাল।

ফোস্কা ফুলে গেলে, লাল হলে এবং সাথে ব্যথা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

পাতলা পায়খানা শুরু হলে দেরী না করে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে থাকুন।

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক :** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পদাক :** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর :** ডাঃ এম. নজরুল ইসলাম; **সদস্য :** ইউসুফ হাসান, ডাঃ এ.এস.এম. মিজানুর রহমান, মুজিবর রহমান ও ডাঃ সেলিনা আমিন; **সার্কুলেশন ম্যানেজার :** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন :** আসেম আনসারী। **প্রকাশক :** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর.বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।
ফোন : ৬০০১৭১-৮ এবং ৬০০২৭১-২, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, টেলেক্স : ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে.।

মুদ্রণে ঃ ব্র্যাক প্রিন্টার্স, ঢাকা।